বুলেটিন নং: ২৪
বর্ষ ৯ ॥ সংখ্যা ২
প্রকাশ কাল: ২০ জুন ২০০৩
শুভেচ্ছা মূল্য: ৮ ৫ ॥ $2

স্বাধিকার

স্বাধিকার কিনুন
স্বাধিকার পড়ুন
আন্দোলনে সামিল হোন

পার্বত্য চট্টগ্রামে আসল সন্ত্রাসী কে?

সত্যদর্শী

জনসংহতি সমিতির প্রধান সন্তু লারমার মুখ থেকে বুদবুদের মতো হরহামেশা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নানা রকম কথাবার্তা উদ্‌গত হয়ে থাকে। ক্লান্তিহীনভাবে তিনি ইউপিডিএফ এর মুণ্ডপাত করে থাকেন। কিন্তু সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বাক্যবিস্তারকারী এই মানুষটি পত্রিকার সাক্ষাতকারে যা বলেছেন তা পড়ে না বোঝার কোন কারণ নেই যে, যে বিশেষণে তিনি ইউপিডিএফ-কে চিহ্নিত করতে চান সেই বিশেষণটি আদতে তারই প্রাপ্য। ২০০০ সালের ১৩ নভেম্বর যুগান্তরের সাথে সাক্ষাতকারে সন্তু লারমা কি বলেছেন তা একটু দেখুন। সাক্ষাতকার-গ্রহণকারী সাংবাদিক যখন তাকে প্রশ্ন করেন রাজনৈতিকভাবে ইউপিডিএফ-কে মোকাবিলা করবেন কিনা, তখন তিনি বলেন:

> "পলিটিক্যালি নয়। এদের গলা টিপে হত্যা করতে হবে। যাতে কিছু না করতে পারে। হাত ভেঙে দিতে হবে, যাতে লিখতে না পারে। ঠ্যাং ভেঙে দিতে হবে, যাতে হাঁটতে না পারে। চোখ অন্ধ করে দিতে হবে, যাতে দেখতে না পারে। যারা চুক্তির পক্ষে জনগণের অধিকারের পক্ষে তারাই এ কাজ করবে।"

শুধু পত্রিকার সাক্ষাতকারে নয়, একেবারে পার্টির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী সংস্থা কংগ্রেসেও সন্তু লারমা চক্র "গলা টিপে হত্যা করার" কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। গত বছর নভেম্বরে খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত তাদের পার্টি কংগ্রেসে যে ৩৩ দফার বিশাল প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তার ১৭ নং দফায় ইউপিডিএফ-কে "কঠোরভাবে মোকাবিলা ও নির্মূল করার" কথা বলা হয়েছে।

সন্তু লারমার এ সব কথাবার্তা যদি কেবল পত্রপত্রিকায় ও পার্টির প্রস্তাবাবলীতে সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলে এ সম্পর্কে লেখালেখির প্রয়োজন হতো না। কারণ মানুষের মতিভ্রম হলে তারা নানা ধরনের প্রলাপ বকে থাকে। এবং সে প্রলাপ বিলাপ আশেপাশের

জনসংহতি সমিতির আত্মসমর্পনের আগে খাগড়াছড়ির চেঙ্গী স্কোয়ারে দেয়ালে সাঁটা পোষ্টারের ছবি। পোষ্টারে লেখা: আপোষ চুক্তি লাথি মারো পূর্ণস্বায়ত্তশাসন কায়েম করো; সমীরণ-সন্তু ভাই ভাই এক রশিতে ফাঁসি চাই; সন্তু হইতে সাবধান; *JSS* এর আপোষনামায় সাংবিধানিক গ্যারান্টি নাই। ছবি তোলা হয় ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮।

লোকজনকে সহ্য করতে হয়। ইউপিডিএফ-এরও নিশ্চয়ই জেএসএস প্রধানের অশোভন ও বিচ্ছিরি কিসিমের প্রলাপ সহ্য করার ক্ষমতা আছে এবং তার প্রমাণ অতীতে বহুবার দেয়া হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে পত্রিকার সাক্ষাতকারে তিনি যা বলেছেন কিংবা কংগ্রেসে দিনভর আলোচনার পর যা প্রসবিত হয়েছে তা কেবল কথার কথা নয় কিংবা পার্টির দলিলপত্রে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি এটা বাস্তব কর্মসূচী হিসেবে নিয়েছেন অন্য সব রাজনৈতিক কর্মসূচীকে ফেলে দিয়ে এবং শুধু তাই নয়, তিনি তার সশস্ত্র সদস্যদের দিয়ে সে কর্মসূচী বাস্তবায়নও করে চলেছেন।

বাস্তবেই তিনি ইউপিডিএফ এর সদস্যদের গলা টিপে হত্যা করছেন, হাত পা ভেঙে দিচ্ছেন ও বর্বরভাবে চোখ উপড়ে দিচ্ছেন। শুধু ইউপিডিএফ সদস্যদের নয় ইউপিডিএফ এর সমর্থক ও এমনকি সাধারণ নিরীহ লোকজনের ওপরও তা করা হচ্ছে। নান্যাচর, হুদুকছড়ি ও কাউখালি এলাকায় তারা সেনাবাহিনীর কায়দায় ইউপিডিএফ সদস্য ও তাদের সমর্থকদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। ইউপিডিএফ এর সমর্থক সন্দেহে কিংবা ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা বশত বা মোটা অংকের চাঁদা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় লোকজনকে নিজ বাস্তুভিটা থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করছে। তাদের সাম্প্রতিক সশস্ত্র আক্রমনের শিকার হয়ে অনেকে আহত ও পঙ্গু হয়েছেন। সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় তারা এসব করে বেড়াচ্ছে।

খাগড়াছড়িতে গত ১২ মে তারা ইউপিডিএফ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের অফিসে সন্ত্রাসী হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা অফিসে কর্মরত ইউপিডিএফ সদস্যদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায় ও অফিসসহ ৮টি দোকান পুড়িয়ে দেয়। ইউপিডিএফ এর অফিসে এভাবে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর প্রধান কারণ হচ্ছে ইউপিডিএফ ও তার অঙ্গ সংগঠনগুলো এই অফিস থেকে তাদের রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। খাগড়াছড়িতে সাম্প্রতিক সময়ে যে কয়েকটি বড় ধরনের সরকার বিরোধী গণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে তা এই অফিস থেকেই সংগঠিত করা হয়েছিল। এক কথায়, ইউপিডিএফ এর স্বনির্ভর এলাকায় অবস্থিত এই অফিসটি জনগণের সাথে সংযোগের ও আন্দোলন সংগঠনের কেন্দ্রে পরিণত হয়, যা সরকার ও জেএসএস এর ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

জাতীয় বেঈমান বিশ্বাসঘাতক সন্তু লারমা চক্র এখন তাদের চুক্তি বাস্তবায়নের কর্মসূচীর কথা বেমালুম ভুলে গেছে। তাদের এখন কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী নেই। সরকারের কর্মসূচীকেই এখন তারা তাদের একমাত্র কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করেছে। আর তা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠা জনগণের নতুন শক্তি ইউপিডিএফ-কে নির্মূল করা যাতে ভবিষ্যতে আর কোন ধরনের গণআন্দোলন গড়ে উঠতে না পারে। আঞ্চলিক পরিষদের গদি টিকিয়ে রাখতে হলে এ ছাড়া তাদের আর কোন পথ নেই। সরকারের স্বার্থের সেবা না করে কোন দালাল জেলা পরিষদ কিংবা আঞ্চলিক পরিষদে থাকতে পারে না। সরকার মাসে মাসে এত বিপুল পরিমাণ বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা কি এমনি এমনি দেবে যদি এতে তার স্বার্থ উদ্ধার না হয়? এটা হচ্ছে এক ধরনের গিভ এন্ড টেক বা দেয়া-নেয়ার সম্পর্ক। সরকারের কাছ থেকে সুযোগ সুবিধা পাওয়ার বিনিময়ে সরকারকেও কিছু দেয়া। আর এই কিছু দেয়া মানেই হলো জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করা, যা সন্তু লারমা চক্র এখন নির্বিচারে ও কোন প্রকার বিবেকের দংশন ছাড়া করে চলেছে। যদি চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার ন্যূনতম ইচ্ছা ও চেষ্টা তাদের থাকতো, তাহলে তারা ইউপিডিএফ এর ঐক্যের প্রস্তাবে রাজী হতো। ইউপিডিএফ জনগণের স্বার্থকে সবার উপরে স্থান দেয় বলে চুক্তিকে অসম্পূর্ণ বলে সমালোচনা করার পরও এর বাস্তবায়নে জেএসএস-কে সহযোগিতা দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। সরকারের দালাল না হলে ইউপিডিএফ-এর এই প্রস্তাবে জেএসএস নেতৃবৃন্দের খুশী হওয়ারই কথা। তাই প্রশ্ন, এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার অর্থ কি? আসলে সরকার ও সেনাবাহিনী বরাবরই চায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মধ্যে বিভেদ ও হানাহানি জিইয়ে থাকুক। ইউপিডিএফ ও জেএসএস-এর মধ্যে সংঘাত চলতে থাকুক। কারণ এতে তাদের লাভ। জনগণের নিজেদের মধ্যে হানাহানি চলতে থাকলে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সম্পদ অবাধে লুটপাট করতে পারবে ও সহজে জুম্ম দিয়ে জুম্ম ধ্বংসের নীল নকসা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে। সরকার সত্যিই সন্তু লারমার মতো এমন বিশ্বস্ত সেবাদাস ও দালাল আর কোন দিন পাবে কিনা সন্দেহ।

২য় পাতায় দেখুন

খাগড়াছড়ির ভুইয়োছড়িতে পাহাড়ি গ্রামে হামলা অগ্নিসংযোগ

স্বাধিকার রিপোর্ট, খাগড়াছড়ি ॥ গত ১৯ এপ্রিল জেলার কমলছড়ির সন্নিকটে ভুইয়োছড়িতে সেনাবাহিনীর সদস্য ও বহিরাগতরা পাহাড়িদের ৯টি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। তারা ব্যাপক লুটপাটও চালায়। রাত সাড়ে এগারটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার প্রতিবাদে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ি যুব ফোরাম ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন চট্টগ্রামে এবং ইউপিডিএফ খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করেছে। তারা ঘটনার তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদানের দাবি জানিয়েছে।

জানা যায়, খাগড়াছড়ি জেলা শহর থেকে ৫ কিলোমিটার দক্ষিণে ভুইয়োছড়িতে বেশ কয়েক বছর আগে সরকার সমতল এলাকা থেকে বহিরাগতদের এনে জোর করে পাহাড়িদের জায়গাজমিতে বসিয়ে দেয়। এরপর থেকে শুরু হয় জমিজমা নিয়ে বিরোধ ও অসন্তোষ। ভুইয়োছড়ির নির্দিষ্ট এলাকায় তাদের বসত দেয়া হলেও পরে বহিরাগতরা সেনাবাহিনীর সহায়তায় পর্যায়ক্রমে আশেপাশের পাহাড়িদের অন্যান্য জমিও বেদখল করতে থাকে। ইদ্রিস আলি, খোকা, শামসু, হাবিল ও সামাদ ইতিমধ্যে পাহাড়িদের সুনির্দিষ্ট মালিকানাধীন জমি জোরপূর্বক দখল নিয়ে বাড়ি তৈরি করেছে। বাধা দিলেও কোন কাজ হয়নি, কারণ তাদের পেছনে রয়েছে সেনাবাহিনী। বহিরাগতদের অধ্যুষিত জায়গায় রয়েছে সেনাক্যাম্প।

ঘটনার দিন আরো ৯ জন বহিরাগত পাহাড়িদের মালিকানাধীন জমিতে বাড়ি তৈরি করার উদ্দেশ্যে ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে ও মাটি কাটে। জমির মালিকরা এতে বাধা প্রদান করলে ব্যাপক কথা কাটাকাটি হয়। তারা বহিরাগতদেরকে বেদখলকৃত জায়গাজমি ছেড়ে দিতে বলে। এই বিরোধের এক পর্যায়ে রাতে বহিরাগত ও সেনাসদস্যরা মিলে পাহাড়িদের গ্রামে হামলা চালায়। সেনা সদস্যরা গ্রামটি ঘিরে ফেলে এবং লোকজনকে জোর করে ঘর থেকে বের করে দেয়। এরপর বহিরাগতরা বাড়িঘরে ঢুকে ব্যাপক লুটপাট চালায় ও আগুন ধরিয়ে দেয়। পাহাড়িদের ৯টি বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। হামলাকারীরা পাহাড়িদের পোষা শুকরগুলো আগুনে পুড়ে ফেলে ও গরু ছাগল নিয়ে যায়। মোঃ আজিজ, হাবিবুর মেম্বার ও আবুল লিডার নামে তিন বহিরাগত এই হামলায় নেতৃত্ব দেয়। ঘটনাকে পাহাড়ি বাঙালি সংঘর্ষ হিসেবে চিত্রিত করার জন্য বহিরাগতরা তাদের নিজেদের ২টি বাড়ি মালামাল খালি করে নিজেরাই পুড়ে ফেলে এবং পাহাড়িরা ঐ দুইটি বাড়ি পুড়ে দেয় বলে অপপ্রচার চালায়।

ভুইয়োছড়ি সেনা ক্যাম্পের অধিনায়ক মেজর সৈকত আলী এই হামলায় প্রত্যক্ষ সহযোগি ও মদদদাতা। তিনি তার দল বল নিয়ে রাত এগারটার দিকে প্রথমে ভুইয়োছড়ির পাহাড়ি গ্রামটি ঘিরে ফেলেন এবং বহিরাগতদেরকে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেন।

হামলার সময় বহিরাগতরা যাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয় তারা হলেন, ১. অনিল প্রসাদ চাকমা (৪২) পিতা বিমল চন্দ্র চাকমা, ২. জ্যোতি চাকমা পিতা বিনোদ বিহারী চাকমা, ৩. রূপান্তর চাকমা (২৮) পিতা শেফালি চরতা চাকমা, ৪. দীপক জ্যোতি চাকমা (৩০) পিতা অজ্ঞাত, ৫. সুজিত চাকমা (২২) পিতা সুরনাথ চাকমা, ৬. কৃষ্ণঙ্কর চাকমা (৫০) পিতা ধ্রুবকর চাকমা, ৭. প্রীতিবিন্দু চাকমা (৪৩) পিতা অক্ষয় মুনি চাকমা, ৮. যতিন বিলাস চাকমা (৫০) পিতা অক্ষয়মুনি চাকমা, ৯. প্রবীন চাকমা (৪৭) পিতা অক্ষয়মুনি চাকমা।

ঘটনার প্রতিবাদে পরদিন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ি যুব ফোরাম ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন চট্টগ্রামে এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। খাগড়াছড়িতেও ইউপিডিএফ বিক্ষোভ মিছিল করে।

টোকিওতে বৈসাবি পালিত

টোকিও প্রতিনিধি ॥ জাপান প্রবাসী জুম্মরা সারম্বরে রাজধানী টোকিওতে বৈসাবি উৎসব পালন করেছে। ১৩ এপ্রিল টোকিওর প্রাণকেন্দ্র ও বিশ্বের ব্যস্ততম রেল স্টেশন "শিনজুকু' এর পূর্ব পার্শ্বে মনোমুগ্ধকর আকাশচুম্বী অট্টালিকার নীচে অবস্থিত একটি মন্দিরে এবারের বৈসাবি পালিত হল। এবারের বৈসাবি উদ্‌যাপনে অংশগ্রহণ করেছে জাপানস্থ জুম্মদের সংগঠন জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক-জাপান সহ আরো কিছু ছোট বড় সংগঠন যারা বিভিন্নভাবে জুম্মদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। জুম্মদের সাথে তুলনীয় ও জাপানে নিশ্চিহ্ন-প্রায় "আইনু" জাতিগোষ্ঠির একটি সংগঠনের অংশগ্রহণ এবারের বৈসাবিতে একটি চমকপ্রদ ঘটনা।

অনুষ্ঠানের কর্মসূচীতে আমাদের ঐতিহ্যবাহী "পাজন" ছাড়াও ভারতের নাগা রান্না, আইনু খাদ্যও পরিবেশন করা হয়। গতবারের মত জুম্মদের ঐতিহ্যবাহী পরিধেয় বস্ত্রের প্রদর্শন বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। এছাড়াও দুই জাপানী তরুণী, যারা কখনো পার্বত্য চট্টগ্রামে যাননি, অত্যন্ত সুন্দরভাবে

শেষ পাতায় দেখুন

এলাকা সংবাদ

মানিকছড়িতে জনতার বিক্ষোভের মুখে জেএসএস সমর্থকরা উধাও

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ গত ৮ জানুয়ারি জেএসএস এর সমর্থকরা ইউপিডিএফ এর একনিষ্ঠ কর্মি লাপ্রুচাই মারমাকে ধরে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। তার বিরুদ্ধে থানায় কোন মামলা ছিল না।

উক্ত ঘটনা শোনার পর মানিকছড়িবাসী বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সদরের স্থানীয় মুরুব্বীসহ ৫০-৬০ জন এলাকাবাসী থানায় গিয়ে লাপ্রুচাই মারমাকে নিয়ে আসে। পরে উত্তেজিত জনতা নিহত মনোকুমার চাকমা ও কৃষ্ণ চাকমার প্রধান আসামী জেএসএস এর সমর্থক রঞ্জন চাকমাকে গণ ধোলাই দেয়। বাকী গুটি কয়েক জেএসএস সমর্থকরাও জনতার রোষের ভয়ে অন্যত্র পালিয়ে যায়।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে জেএসএস সদস্য ও সমর্থকরা মানিকছড়ি এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। সাধারণ জনগণের ওপর অত্যাচার, মুক্তিপণ আদায়ের জন্য নিরীহ লোকজন অপহরণ, ডাকাতি ইত্যাদি গণবিরোধী কার্যকলাপের জন্য জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। গত বছর ইউপিডিএফ সেখানে জনগণের সমর্থন নিয়ে কার্যক্রম প্রসারিত করলে তারা তাদের সমাজ বিরোধী কাজ গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়। অনেকে জনতার রোষের ভয়ে অন্যত্র পালিয়ে যায়। গুটি কয়েক মানিকছড়ি সদরে পুলিশের সহায়তায় অবস্থান করে।

কমলছড়ি ইউপি নির্বাচনে জেএসএস প্রার্থীর পরাজয়

ইটছড়িতে সশস্ত্র হামলা করতে গেলে জনগণের প্রতিরোধ

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ গত ৮ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি সদর থানার আওতাধীন ইউনিয়ন সমূহে ইউপি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কমলছড়ি ইউনিয়ন খাগড়াছড়ি সদর থানার অধীন। এই ইউনিয়নে জেএসএস ইটছড়ি গ্রামের যোগ্যচন্দ্র চাকমাকে চেয়ারম্যান পদে দাঁড় করায়। কিন্তু নির্বাচনে তিনি বিপুল ভোটে হেরে যান। এতে জেএসএস এর লোকজন ক্ষুব্ধ হয় এবং যারা তাদের প্রার্থীকে ভোট দেয়নি তাদেরকে 'উপযুক্ত শাস্তি' দেয়ার হুমকি দিতে থাকে। এক পর্যায়ে জেএসএস -এর সশস্ত্র লোকজন জেএসএস এর সাবেক সদস্য পিচিলং চাকমার বাড়ি ঘেরাও করে এবং মেরে ফেলার জন্য তাঁকে খুঁজতে থাকে। কিন্তু ইটছড়ি জনগণ একতাবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং জেএসএস এর কর্মিদের ধাওয়া করে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেন। এই ধাওয়া ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। জেএসএস এর কর্মিরা জনগণের ভয়ে ইটছড়ি গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এতদিন ধরে জেএসএস এর কর্মিদের উৎপাত ও অন্যায় জোর জবরদস্তিতে অতিষ্ঠ ইটছড়ি জনগণ বর্তমানে স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলছেন।

জমি বন্দোবস্তী দেয়াকে কেন্দ্র করে জনৈক মেজরের হুমকি

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ সরকার ২৫৬ নং গামাটী ঢালা মৌজার একটি জায়গায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পের অধীনে বহিরাগত পুনর্বাসনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে পাহাড়িদের দখলাধীন ও মালিকানাধীন জায়গা জমি বেদখল ও নানা ধরনের সমস্যা ও সংঘর্ষ হতে পারে এই আশংকা থেকে সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান ধ্রুব জ্যোতি দেওয়ান প্রশাসনসহ নুনছড়ি সাবজোন কমান্ডার মেজর শহীদের নিকট প্রকল্প সম্পর্কে আপত্তি জানান। কারণ ইতিপূর্বেও ঐ মৌজায় বসবাসকারী পাহাড়িদের অনেক জায়গা জমি বেদখল করে বহিরাগতদের পুনর্বাসন দেয়া হয়েছিল। অনেক পাহাড়ি তাদের জমি জমা হারান ও অর্থনৈতিকভাবে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হন।

হেডম্যান ধ্রুবজ্যোতি দেওয়ানের আপত্তির পর প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়। তবে মেজর শহীদ হেডম্যানকে এই মর্মে নির্দেশ দেয় যে, আলোচ্য জায়গায় যাতে পাহাড়ি কিংবা বাঙালি কাউকে বাড়িঘর নির্মাণ ও দখল করার অনুমতি দেয়া না হয়।

যখন প্রকল্প নিয়ে এ ধরনের অবস্থা চলছিল তখন ঐ এলাকার বাসিন্দা পিয়ারী মোহন চাকমার মৃত্যু হয়। মারা যাওয়ার আগ মুহূর্তে তিনি তার ছেলেদেরকে তাগিদ দিয়ে যান যেন উক্ত মৌজায় অবস্থিত তার বন্দোবস্তীকৃত জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের বাড়িতে থাকা মংসিপ্রু মারমাকে বাড়ি তৈরি করে বসবাস করার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। পিয়ারী মোহন চাকমার ইচ্ছা মোতাবেক মংসিপ্রু মারমা ঐ জায়গায় ঘর নির্মান করে বসবাস শুরু করেন।

গত ১০ মার্চ মাইসছড়ি গুচ্ছগ্রাম থেকে ২/৩ জন বহিরাগত মেয়ে তার বাড়ির আশেপাশের লাকড়ি কুড়াতে আসে। তাদেরকে বাধা দিতে গেলে এক বহিরাগত মেয়ে হাতে সামান্য আঘাত পায়। ঘটনাটি তুচ্ছ একটি ব্যাপার। কিন্তু এই সামান্য ঘটনার বিচার চাওয়ার জন্য ২০/২৫ জন বহিরাগত নারী পুরুষ সদ্য নির্বাচিত চেয়ারম্যান প্রীতিবিন্দু দেওয়ানের বাড়িতে জড়ো হয় এবং একইভাবে তারা মেজর শহীদের কাছেও নালিশ দেয়। মেজার শহীদ ১২ মার্চ সকাল ১১টায় ধ্রুবজ্যোতি দেওয়ান ও প্রীতিবিন্দু দেওয়ানকে নুনছড়ি ক্যাম্পে ডাকেন। তিনি কোন প্রকার সৌজন্যতার ধারে কাছে না গিয়ে হেডম্যান ধ্রুবজ্যোতি চাকমাকে অপমান করেন এবং সোজা কথায় হুমকি দিয়ে বলেন, "তুমি আমার কথা রাখনি কেন? আমার অনুমতি না নিয়ে পাহাড়িরা ঘর নির্মাণ করেছে। এভাবে হলে ভবিষ্যতে তোমার সাথে সম্পর্ক ভালো হবে না!"।

সাধারণ লোকজনের প্রশ্ন নিজের বন্দোবস্তীকৃত জায়গাজমিতে বাড়িঘর বানাতে কোন অজ্ঞাত অখ্যাত সেনা কমান্ডারের অনুমতি নিতে হবে কেন? তিনি কে? দেশে কি আইন বলে কোন কিছু নেই? সেনাবাহিনীর মেজর লেফটেন্যান্ট সার্জেন্টরা কি এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে বছরের পর বছর তাদের ইচ্ছে মত হুকুম বরদার করে যাবে?

পার্বত্য ভিক্ষু সংঘের হানাহানি বন্ধের আহ্বানকে স্বাগত জানিয়েছে ইউপিডিএফ

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের আহ্বায়ক অনিল চাকমা গত ১৯ মার্চ সংবাদ পত্রে দেয়া এক বিবৃতিতে পার্বত্য ভিক্ষু সংঘের দিঘীনালা সম্মেলনে ঘোষিত হানাহানি বন্ধের আহ্বানকে স্বাগত জানিয়েছেন।

ভিক্ষু সংঘের উক্ত আহ্বানকে অত্যন্ত সময়োপযোগী ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে আখ্যায়িত করে বিবৃতিতে তিনি বলেন, ইউপিডিএফ একটি গণতান্ত্রিক দল হিসেবে প্রথম থেকেই আত্মঘাতি সংঘাত ও হানাহানি বন্ধের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইউপিডিএফ নেতা আরো বলেন, দায়ক দায়িকা তথা আপামর জনসাধারণের দুর্ভোগ ও দুর্দশা লাঘবের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাবান ভিক্ষুবৃন্দ যে অগ্রণী ভূমিকা নিতে যাচ্ছেন তা পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়ে থাকবে। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলনরত দল হিসেবে এই মহতী উদ্যোগের প্রতি ইউপিডিএফ-এর সব সময়ই সমর্থন ও সহযোগিতা থাকবে।

অনিল চাকমা আরো বলেন, ইউপিডিএফ কোন সময় নিজেদের মধ্যে আত্মঘাতী সংঘাত চায়নি এবং এখনো চায় না। ইউপিডিএফ বহু আগেই জেএসএস নেতৃবৃন্দের প্রতি ঐক্য ও সমঝোতার আহ্বান জানিয়ে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু জেএসএস নেতৃত্বের একগুয়েমি ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে ইউপিডিএফ-কে নির্মূল করার নীতির কারণে দুই পার্টির মধ্যে কোন অর্থবহ আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।

বাঘাইছড়িতে ইউপি নির্বাচনে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা

বাঘাইছড়ি প্রতিনিধি ॥ ২৭শে মার্চ ছিল বাঘাইছড়ি উপজেলায় ইউনিয়ন পরিষদসমূহের নির্বাচনের দিন। ৩৫ নং বঙ্গলতলী ইউনিয়নে জেএসএস সমর্থিত প্রার্থীকে জয়যুক্ত করার জন্য মন্টু বিজয় চাকমা (পিতা যামিনী মোহন চাকমা গ্রাম জারুলছড়ি, মারিশ্যা) দিঘীনালা থেকে ১০ জনের একটি সন্ত্রাসী গ্রুপকে ১ নং জারুলছড়ি ভোট কেন্দ্রে নিয়ে আসে। সন্ত্রাসীরা ভোট চলাকালিন সময়ে সাধারণ ভোটারদের ভোট প্রদানে বাধা দেয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এ খবর সারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে সাধারণ জনগণ সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধ করার জন্য এগিয়ে আসে। ফলে সন্ত্রাসীদের ভোটকেন্দ্রে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা ভন্ডুল হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, মন্টু বিজয় চাকমা তাদের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দেয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ ভোটারদের ওপর চাপ দিয়ে আসছিল। তারা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও সমর্থকদেরকেও অস্ত্র দেখিয়ে হুমকি দেয়।

ইউপিডিএফ ও জেএসএস -এর মধ্যে মধ্যস্থতার প্রচেষ্টা

৩য় পাতার পর

ফিরিয়ে আনার জন্য আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালায়। দেশ বিদেশের কিছু ব্যক্তি বিশেষও সমঝোতার উদ্যোগ নেন। কিন্তু জেএসএস এর আত্মম্ভরিতা ও একগুয়েমির কারণে তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ক. ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে একটি আন্তর্জাতিক ফোরামে অংশগ্রহণের জন্য ইউপিডিএফ এর এক শীর্ষ নেতা জেনেভায় যান। সে সময় জেএসএস এর এক প্রতিনিধিও সেখানে ছিলেন। এ সময় জুম্ম জনগণের শুভাকাঙ্ক্ষীদের উদ্যোগে ও উপস্থিতিতে ইউপিডিএফ ও জেএসএস এর প্রতিনিধিদের নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। জুম্ম জনগণের শুভাকাঙ্ক্ষীরা অর্থবহ আলোচনার মাধ্যমে দুই পার্টিকে ঐক্য সমঝোতায় উপনীত হওয়ার আহ্বান জানান। ইউপিডিএফ এর প্রতিনিধি ঐ মিটিঙে পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দেন যে ইউপিডিএফ জেএসএস এর সাথে আলোচনায় বসতে ও ঐক্য স্থাপনে সবসময় প্রস্তুত। তিনি এও জানিয়ে দেন যে, এমনকি "এই মুহূর্তে জেনেভাতেও জেএসএস এর সাথে সমঝোতামূলক চুক্তি স্বাক্ষরে ইউপিডিএফ রাজী রয়েছে এবং এ ব্যাপারে ইউপিডিএফ প্রতিনিধিকে তার পার্টির পক্ষ থেকে পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।" অপরদিকে, আলোচনা ও সমঝোতা প্রশ্নে জেএসএস প্রতিনিধি সুনির্দিষ্টভাবে কোন কিছু বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

ইউপিডিএফ এর উক্ত প্রতিনিধি জেনেভায় থাকাকালে একজন শুভাকাঙ্ক্ষী দুই পার্টির মধ্যে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দেন। ইউপিডিএফ খুশী হয়ে তার এই প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং তাকে ঢাকায় আসার আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু দৃশ্যতঃ জেএসএস এর পক্ষ থেকে ইতিবাচক সাড়া না পাওয়ায় তার ঢাকা সফর অনুষ্ঠিত হয়নি এবং তার মধ্যস্থতার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়।

খ. অন্য একটি মধ্যস্থতার প্রস্তাব আসে মিজোরাম সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী ও মিজোরাম বিধান সভার Congress Legislature Party এর ডেপুটি লিডার নিরুপম চাকমার কাছ থেকে। তিনি ২০০১ সালের ২৭ জুন ইউপিডিএফ ও জেএসএস প্রধানের কাছে এক লিখিত চিঠিতে এই প্রস্তাব দেন। ইউপিডিএফ ৪ জুলাই ২০০১ তার এই প্রস্তাব গ্রহণ করে উত্তর দেয়। তিনি জেএসএস এর কাছ থেকে কি ধরনের উত্তর পেয়েছেন বা আদৌ পেয়েছেন কিনা তা ইউপিডিএফ জানতে পারেনি। তবে তার এই প্রচেষ্টাও আর এগোয়নি।

গ.২০০১ সালের ১লা নভেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম সামাজিক উন্নয়ন ও সমন্নয় কমিটি নামে খাগড়াছড়ির একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি লিফলেট প্রচার করা হয়। কমিটি ইউপিডিএফ ও জেএসএস এই দুই পার্টিকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখা ও সমঝোতায় উপনীত হতে আহ্বান জানায়। ইউপিডিএফ এক চিঠির মাধ্যমে তাদের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানায় এবং জানায় যে ইউপিডিএফ আলোচনার মাধ্যমে জেএসএস-এর সাথে একটি আপোষ নিস্পত্তিতে উপনীত হতে রাজী রয়েছে।

ঘ. এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের ধর্মীয় গুরুরাও বিভিন্ন সময় দুই পার্টির মধ্যে সংঘাত বন্ধ করে সমঝোতায় উপনীত হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন।

শেষ কথা: পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ চায় দুই পার্টির মধ্যে সংঘাত ও হানাহানি বন্ধ হোক ও তাদের মধ্যে ঐক্য-সমঝোতা হোক। জনগণের এই আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত পবিত্র। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় হলো, জনসংহতি সমিতির প্রধান সন্তু লারমার একগুঁয়েমি ও ফ্যাসিবাদী মানসিকতার কারণে আজ পর্যন্ত জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে দুই পার্টির মধ্যে হানাহানি ও সংঘাত বন্ধ করা যায়নি। এই সত্য আজ দিবালোকের মতো সবার কাছে পরিস্কার। জনগণের মনে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে: চুক্তি বাস্তবায়ন যদি জেএসএস এর কর্মসূচী হয় এবং সন্তু লারমা যদি আন্তরিকভাবে তার নিজের স্বাক্ষর করা চুক্তি বাস্তবায়ন করতে আন্তরিক হন, তাহলে সেই চুক্তি বাস্তবায়নে ইউপিডিএফ এর সহযোগিতার প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন কি কারণে এবং কেন উল্টো তিনি ইউপিডিএফ-কে নির্মূলের জন্য কংগ্রেসে কর্মসূচী গ্রহণ করেন ও তা বাস্তবায়নে মরিয়া হয়ে ওঠেন? জেএসএস এর এই গণআকাঙ্ক্ষা-বিরোধী কর্মকান্ডের কি কারণ থাকতে পারে এবং জেএসএস এর পক্ষ থেকে এর যুক্তি ও ব্যাখ্যা কি?

আসল কথা হলো ইউপিডিএফ ও জেএসএস-এর মধ্যেকার এই দ্বন্দ্ব হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন ও পুরাতনের মধ্যে দ্বন্দ্ব, প্রগতিশীল শক্তি ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব। আদর্শবাদীতা ও আদর্শহীনতার মধ্যে দ্বন্দ্ব। জনগণের পক্ষের শক্তি ও জনগণের বিপক্ষ শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব। আন্দোলনের পক্ষের শক্তি ও আন্দোলন বিরোধী শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব। ইউপিডিএফ এই দ্বন্দ্বের প্রথমোক্তটির প্রতিনিধিত্ব করে। অপরদিকে জেএসএস প্রতিনিধিত্ব করে শেষোক্তটির।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আসল সন্ত্রাসী কে?

১ম পাতার পর

ইতিহাসে বার বার প্রমাণিত হয়েছে আসল শত্রুর চাইতে জাতীয় বিশ্বাসঘাতকরাই সবচেয়ে ভয়ংকর এবং জাতি ও জনগণকে তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করতে পারে। রামায়ণে রাবণ রাজার পরাজয়ের কারণ হলো ঘরশত্রু বিভীষণ। আর মীর জাফর বিশ্বাসঘাতকতা করার ফলেই বাংলার জনগণকে দুই শ' বছর ধরে বৃটিশ শাসনের অধীনে চরম দুর্দশার মধ্যে থাকতে হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের বর্তমান দুর্দশা ও ভোগান্তির অন্যতম প্রধান কারণ হলো সরকারের বিশ্বস্ত খাদেম দালালরাজ সন্তু লারমা। যথার্থ অর্থে তিনিই হলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভীষণ বা মীর জাফর।

সন্ত্রাস প্রসঙ্গ নিয়ে এই লেখাটি শুরু করা হয়েছিল। আবার সে প্রসঙ্গে আসা যাক। যে লোক তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে গলা টিপে হত্যা করার কথা বলে, হাত পা ভেঙে দেয়ার কথা বলে, চোখ উপড়ে ফেলে দেয়ার কথা বলে এবং সত্যিকারভাবে তার সে কথাকে সে কাজে পরিণত করে, তখন তাকে কি বলা সঙ্গত হবে? লেখার শুরুতে যে সাক্ষাতকারটি উদ্ধৃত করা হয়েছিল তা কি বিশ্বাস করা যায় কোন রাজনৈতিক নেতার মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে? যিনি এভাবে সাক্ষাতকারের মাধ্যমে সরাসরি তার লোকজনকে হত্যার নির্দেশ দিতে পারেন তিনি কিভাবে দিব্যি আঞ্চলিক পরিষদের গদিতে আসীন থাকতে পারেন? যদি সন্ত্রাসের অপরাধে কাউকে গ্রেফতার করতে হয় তাহলে সরকারের উচিত প্রথমেই সন্তু লারমাকে গ্রেফতার করা। কিন্তু সরকারের কাছ থেকে সেটা আশা করা হবে দুরাশা মাত্র। এক সন্ত্রাসীর সাথে আর এক সন্ত্রাসীর ভাব হলে সাধারণ জনগণের আর বাঁচার উপায় থাকে না।

তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেয়া যায় যে, ইউপিডিএফ -এর সদস্যরা সন্ত্রাসী কাজে লিপ্ত, তখনো কি সন্তু লারমা গলা টিপে তাদেরকে হত্যা করার কথা বলতে পারেন? দেশে কি আইন আদালত নেই? কেউ সন্ত্রাসী কাজে লিপ্ত হলে তাকে ধরার জন্য পুলিশ রয়েছে। বিচার করার জন্য রয়েছে আদালত। সন্ত্রাস মোকাবিলা করা হচ্ছে সরকারের কাজ। তাহলে কি সন্তু লারমারা সরকারের কাছ থেকে সন্ত্রাস মোকাবিলার ঠিকাদারী পেয়েছেন যেমনভাবে এক সময় সেনাসৃষ্ট পিপিএসপিসি নামক সন্ত্রাসী মুখোশ বাহিনী পেয়েছিল?

নীরদ চন্দ্র চৌধুরী তার An Autobiography of an Unknown Indian বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন, "Very few people seem to realize that nations stand in need of leadership in order to perish or to rot away no less than to rise and achieve greatness."

(মনে হয় এটা খুব কম লোকে অনুধাবন করতে পারে যে, কোন জাতির উত্থান ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য যে নেতৃত্বের দরকার হয়, বিলুপ্তি কিংবা পঁচে যাওয়ার জন্যও সে নেতৃত্বের কম দরকার হয় না)।

লেখকের সাথে আমাদের অবশ্যই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু এ কথা অবশ্যই সত্য যে, একটি জাতির জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাজনৈতিক নেতৃত্ব সঠিক ও যোগ্য হলে যেমন জাতির উত্থান ত্বরান্বিত হয়, তেমনি রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি সঠিক পথে চালিত না হয় তাহলে তার মাশুল দিতে হয় পুরো জাতি ও জনগণকে। বর্তমানে কি আমরা জনসংহতি সমিতির প্রধান সন্তু লারমার জাতিকে চরম অধঃপতন ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়ার নেতৃত্ব দেখতে পাচ্ছি না? আমরা তার এই ধ্বংসাত্মক খেলা অবাধে চলতে দিতে পারি না। তার ধ্বংসাত্মক নেতৃত্বকে পরাস্ত করে আমাদেরকে অবশ্যই জনগণের সঠিক ও যোগ্য নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। না হলে জাতি ও জনগণের ভবিষ্যত চরম অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে থাকবে।

ইউপিডিএফ ও জেএসএস -এর মধ্যে মধ্যস্থতার প্রচেষ্টা

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বা ইউপিডিএফ ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি রাজনৈতিক বাস্তবতা। জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ যখন আপোষ, আত্মসমর্পন ও জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলির পথ ধরেন তখন থেকেই এই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। পরে সরকারের সাথে চুক্তি ও আত্মসমর্পনের পর ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ (তখন ইউপিডিএফ গঠন হয়নি) তার সমালোচনা করলে জেএসএস তা মোকাবিলার জন্য তথ্য, যুক্তি ও আলোচনার পদ্ধতি গ্রহণের বদলে উগ্র পেশীশক্তি ব্যবহার করতে থাকলে দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য সংঘাতের রূপ নেয়। চুক্তির সমালোচনার জবাবে জেএসএস তখনো এবং আজ পর্যন্ত লিখিতভাবে কোন উত্তর দেয় নি। জনগণের জিজ্ঞাসার কোন জবাবও তারা দেয়নি। বরং সেই সময় জেএসএস ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ ও তিন সংগঠনকে নির্মূল করার জন্য সরকার ও সেনাবাহিনীসহ সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাথে এক 'পবিত্র ঐক্য' গঠন করে। তিন সংগঠনের নেতা কর্মিদেরকে তারা ধরে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা ঝুলিয়ে দেয়, শারীরিক নির্যাতন চালায় ও বিভিন্নভাবে হুমকি দেয়। আত্মসমর্পনের পর এই নিপীড়নের মাত্রা বহুগুণ বেড়ে যায়। ১৯৯৮ সালের ৪ঠা মে প্রকাশ্য দিবালোকে সন্তু লারামার নির্দেশে প্রদীপ লাল ও কুসুম প্রিয়কে নির্মমভাবে খুন করা হয়। এরপর খাগড়াছড়ির অদূরে হরেন্দ্র ও হুরুক্যাকে, দিঘীনালায় আনন্দময় ও মৃনাল এবং বাঘাইছড়িতে বীরলালকে সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীরা নিষ্ঠুরভাবে খুন করে। এভাবে একের পর এক তিন সংগঠনের নেতা কর্মি খুন হতে থাকলে ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন। ইউপিডিএফ অধঃপতিত ও আদর্শিকভাবে বিচ্যুত জেএসএস-এর খুন ও সন্ত্রাসের রাজনীতিকে প্রতিহত করতে ব্যাপক জনগণকে সংগঠিত করতে থাকে। এভাবে দুই পক্ষের মধ্যে আদর্শিক ও রাজনৈতিক লাইনের দ্বন্দ্বকে জেএসএস প্রকাশ্য সংঘাতের দিকে নিয়ে যায়।

ইউপিডিএফ-এর ঐক্য ও সমঝোতার আহ্বান:

ইউপিডিএফ গঠিত হয় ১৯৯৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর। তার আগে জেএসএস এর আদর্শিক বিচ্যুতি ও চুক্তির সমালোচনায় সক্রিয় ছিল তিন সংগঠন - পাহাড়ি গণ পরিষদ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন। এই তিন সংগঠন আলোচনার মাধ্যমে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ নিস্পত্তির আহ্বান জানায়। এমনকি চুক্তি স্বাক্ষরের আগেও তিন সংগঠন আলোচনার প্রস্তাব দেয়। সন্তু লারমা তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে বহু আগে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে সরকারের সাথে আপোষ চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হলে তিনি তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মতামত নেবেন। কিন্তু তিনি সরকারের সাথে আলোচনা ও চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে কোন সময় অবগত করেননি। মতামত নেয়াতো দূরের কথা। এমনকি চুক্তিতে কি আছে সে সম্পর্কে তিনি তার পার্টির গুটি কয়েক নেতৃস্থানীয়দের ছাড়া আর কাউকে জানাননি। জেএসএস এর দ্বিতীয় সারির নেতা ও সাধারণ কর্মিরাও চুক্তি সম্পর্কে পুরোপুরি অন্ধকারে ছিলেন।

ইউপিডিএফ প্রথম থেকেই আলোচনার মাধ্যমে দুই পার্টির মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত নিরসনের চেষ্টা চালিয়ে আসছে এবং এ চেষ্টায় ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ বরাবরই ছিলেন আন্তরিক। চুক্তির সমালোচনা করলেও, চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য যদি জেএসএস কর্মসূচী ঘোষণা করে তাহলে সেই কর্মসূচীতে সমর্থন দেয়ার প্রতিশ্রুতি ইউপিডিএফ এর পক্ষ থেকে দেয়া হয়। কিন্তু তা সত্বেও জেএসএস চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য কোন কর্মসূচী গ্রহণ না করে ইউপিডিএফ কে নির্মূলের কর্মসূচী তাদের সম্মেলনে গ্রহণ করে। শুধু কর্মসূচী গ্রহণ করে বা বক্তব্য বিবৃতিতে ইউপিডিএফ কে গলা টিপে হত্যা করার ঘোষণা দিয়ে সন্তু লারমারা ক্ষান্ত হননি, তারা ইউপিডিএফ এর ওপর একের পর এক সশস্ত্র সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।

তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার চেষ্টা:

দেশে বিদেশের অনেক সংগঠন ও ব্যক্তি বিশেষ ইউপিডিএফ ও জেএসএস-এর মধ্যেকার বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসার উদ্যোগ নিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় জনসংহতি সমিতির প্রধান সন্তু লারমার একগুঁয়েমির কারণে তাদের মহৎ উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যায়। নিম্নে সংক্ষেপে তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার প্রচেষ্টা তুলে ধরা হল:

১. ১৯৯৮ সালের ৪ঠা এপ্রিল পানছড়ির লতিবানে সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীরা প্রদীপ লাল ও কুসুম প্রিয় চাকমাকে প্রকাশ্য দিবালোকে মধ্যযুগীয় কায়দায় খুন করে। এ ঘটনায় খাগড়াছড়ি বাসী মর্মাহত ও বিমূঢ় হয়ে যান। ১০ এপ্রিল খাগড়াছড়ির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ মহাজন পাড়াস্থ সূর্যশিখা ক্লাবে এক সভার আয়োজন করেন। সেখানে উক্ত খুনের তীব্র নিন্দা জানানো হয়। তারা এ ধরনের সহিংসতা বন্ধে কি করা যায় সে ব্যাপারে আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে উপেন্দ্র লাল চাকমাকে আহ্বায়ক করে একটি শান্তি কমিটি গঠন করা হয় ও এই মর্মে সিদ্ধান্ত হয় যে, পাহাড়িদের তিন গণতান্ত্রিক সংগঠন পাহাড়ি গণ পরিষদ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন (তখনো ইউপিডিএফ গঠন হয়নি) ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই কমিটি শীঘ্রই উদ্যোগ গ্রহণ করবে। মিটিঙে দুই পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করার দায়িত্ব উপেন্দ্র লাল চাকমাকে দেয়া হয়। এরপর সমঝোতা প্রচেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে উপেন্দ্র লাল সন্তু লারমার সাথে সাক্ষাত করেন এবং তিন সংগঠনের সাথে আলোচনায় বসার জন্য তাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু সন্তু লারমা সরাসরি আলোচনার প্রস্তাব নাখোশ করে দেন। ফলে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় উপনীত হওয়ার প্রথম প্রচেষ্টা শুরুতেই ব্যর্থ হয়ে যায়।

২. এই প্রেক্ষাপটে ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে UNPO (Unrepresented Nations and Peoples Organisations) এর একজন সম্মানীত প্রতিনিধি ঢাকায় আসেন। তিনি দুই পার্টির মধ্যে আলোচনা শুরুর উদ্যোগ নেন। তিন সংগঠন তার এই উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানায় এবং তাকে জানিয়ে দেয় যে, তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ যে কোন সময় জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায় বসতে রাজী আছেন। তিনি একই প্রস্তাব সেই সময় ঢাকায় অবস্থানরত জেএসএস-এর দুই শীর্ষ স্থানীয় নেতার কাছেও পেশ করেন। জেএসএস নেতৃবৃন্দ তাকে জানান যে, এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ও আনুষ্ঠানিক জবাব দেয়ার আগে তাদেরকে তাদের নেতা সন্তু লারমার সাথে আলোচনা করতে হবে।

ইউএনপিও প্রতিনিধি আগষ্ট মাসে আবার ঢাকায় আসেন এবং রাঙ্গামাটি গিয়ে সরাসরি সন্তু লারমার সাথে দেখা করেন। তিনি সে সময় সন্তু লারমার কাছ থেকে ইতিপূর্বে দেয়া তার প্রস্তাবের জবাব জানতে চান। ইউএনপিও প্রতিনিধি সন্তু লারমার সাথে তার কি আলাপ হয়েছে সে সম্পর্কে তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে অবগত করেন। তিনি জানান জেএসএস নেতৃবৃন্দ তিন সংগঠনের সাথে আলোচনায় বসতে রাজী হয়েছেন। এমনকি তাদের আলোচনায় এটাও ঠিক হয় যে, জেএসএস এর পক্ষে গৌতম কুমার চাকমা দুই সপ্তাহের মধ্যে তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করবেন। ইউএনপিও প্রতিনিধি তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে আরো জানান, এমনকি জেএসএস নেতৃবৃন্দ এটাও প্রস্তাব করেন যে জেএসএস এর পক্ষে অনুষ্ঠিতব্য আলোচনায় অংশ নেবেন গৌতম কুমার চাকমা এবং তারা দাবি করেন তিন সংগঠনের পক্ষ থেকে যেন রবিশংকর চাকমা প্রতিনিধিত্ব করেন।

তিন সংগঠন জনসংহতি সমিতির উক্ত প্রস্তাবে রাজী রয়েছে বলে ইউএনপিও প্রতিনিধিকে জানিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, জেএসএস নেতৃবৃন্দ তাদের কথার বরখেলাপ করেন এবং শেষ পর্যন্ত গৌতম কুমার চাকমা কিংবা জেএসএস এর পক্ষে অন্য কেউ তিন সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হন।

এরপর ১৯৯৯ সালের মে মাসে ইউএনপিও-র উক্ত প্রতিনিধি তৃতীয় বার ঢাকা সফরে আসেন। তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তাকে জেএসএস-এর পক্ষ থেকে যোগাযোগ না হওয়ার কথা অবগত করেন এবং এ ব্যাপারে তার পরামর্শ কামনা করেন। জেএসএস নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার পর তিনি তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে জানান, যোগাযোগ না করার কারণ হিসেবে জেএসএস নেতৃবৃন্দ তাকে বলেছেন যে ১০ই নভেম্বর মাইসছড়িতে জেএসএস সদস্যদের ওপর হামলা হওয়ার কারণে তারা তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করেননি। জেএসএস এর ঐ সদস্যরা লারমার মৃত্যুবার্ষিকী পালন শেষে খাগড়াছড়ি থেকে ফিরছিল।

জনসংহতি সমিতির উক্ত বক্তব্য মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়। ঐ দিন কি ঘটেছে বা এর জন্য কারা দায়ি সে প্রসঙ্গ বাদ দিলেও, তিন সংগঠনের সাথে আলোচনা শুরু করার জন্য গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক যোগাযোগ না করার কারণ হিসেবে ঐ ঘটনা অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক। কারণ উক্ত ইউএনপিও প্রতিনিধি ও জেএসএস নেতা সন্তু লারমার মধ্যে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সে অনুসারে ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে তিন সংগঠনের সাথে তাদের যোগাযোগ করার কথা ছিল। অন্যদিকে, ঐ ঘটনাটি ঘটেছে ১৯৯৮ সালের ১০ই নভেম্বর। সুতরাং তিন সংগঠনের সাথে যোগাযোগ না করার কারণ হিসেবে জেএসএস নেতৃবৃন্দ যা বলেছেন তা এক জলন্ত মিথ্যাচার। এটা জেএসএস নেতৃবৃন্দের জঘন্য কপটতা ও শঠতাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

৩. ১৯৯৮ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে হংসধ্বজ চাকমা ও অনন্ত বিহারী খীসা ঢাকায় আসেন "অধিকার" কর্তৃক আয়োজিত একটি সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য। তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এই সুযোগকে কাজে লাগান এবং তাদের সাথে জেএসএস-তিন সংগঠনের দ্বন্দ্ব ও সম্ভাব্য আলোচনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ সময় একজন প্রতিষ্ঠিত জুম্ম ব্যবসায়ীও উপস্থিত ছিলেন। তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন ও জেএসএস-এর সাথে যে কোন সময় আলোচনায় বসতে রাজী আছেন বলে জানিয়ে দেন। তাদের সাথে আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় যে, হংসধ্বজ চাকমা ঢাকা থেকে ফিরে সন্তু লারমার সাথে দেখা করবেন এবং তিন সংগঠনের সাথে বৈঠকে বসতে সন্তু লারমাকে রাজী করাতে চেষ্টা চালাবেন। তাছাড়া এটাও সিদ্ধান্ত হয় যে তিনি সন্তু লারমার সাথে তার কি আলোচনা হয়েছে তা অনন্ত বিহারী খীসার মাধ্যমে তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে অবহিত করবেন। কিন্তু সন্তু লারমার সাথে তার কি আলোচনা হয়েছে সে সম্পর্কে তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আজ পর্যন্ত কিছুই জানতে পারেনি।

৪. ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়িতে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে জেলা পর্যায়ে ইউপিডিএফ ও জেএসএস-এর মধ্যে প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই মিটিঙের কিছুদিন আগে ৭ ফেব্রুয়ারি জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্যরা দিঘীনালায় ইউপিডিএফ এর একজন সম্ভাবনাময় কর্মি দেবোত্তম চাকমাকে গুলি করে হত্যা করেছিল। তা সত্বেও জুম্ম জনগণের বহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে ইউপিডিএফ জেলা পর্যায়ে হলেও জেএসএস এর সাথে আলোচনায় বসতে রাজী হয়। এই বৈঠকে হানাহানি বন্ধে তিন দফা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো যদিও উক্ত বৈঠকটি ছিল আনুষ্ঠানিক ও দুই পার্টির পক্ষ হয়ে বৈঠকে উপস্থিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়, তথাপি জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোলাখুলিভাবে ঘোষণা দেয় যে তারা এই চুক্তি মানবে না। এমনকি কলকাতা থেকে ফিরে এসে সন্তু লারমাও জানিয়ে দেন যে তিনি এই চুক্তি মানবেন না। এভাবে জেএসএস নেতৃবৃন্দ নিজেদের স্বাক্ষরিত চুক্তিকে প্রথম থেকে অস্বীকার করে বসেন ও চুক্তির প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধা দেখাতে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত জেএসএস-এর সশস্ত্র সদস্যরা ইউপিডিএফ-এর ওপর সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে উক্ত চুক্তিকে পদদলিত করে। তারা ২০০০ সালের ৮ মার্চ পানছড়িতে তারা কুমার চাকমাকে ও ২৮ এপ্রিল মহালছড়িতে সদয় সিন্ধু চাকমা ও সুই মং মারমাকে গুলি করে হত্যা করে। এভাবে জেলা পর্যায়ে একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে দুই পার্টির মধ্যে যে শান্তি ও ঐক্যের প্রক্রিয়া শুরু হয় তা জেএসএস-এর সশস্ত্র সদস্যরা বন্দুকের নল দিয়ে নস্যাত করে দেয়।

৫. ২০০০ সালের আগষ্ট মাসে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। খাগড়াছড়ি থেকে উপেন্দ্র লাল চাকমা, অনন্ত বিহারী খীসা, নবীন কুমার ত্রিপুরা ও মংক্যচিং চৌধুরী; রাঙ্গামাটি থেকে গৌতম দেওয়ান, মথুরা লাল চাকমা, জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা ও হিমাংশু চাকমা এবং বান্দরবান থেকে জুমলিয়ান বম ও ক্য চ প্রু মারমা সহ আরো অনেকে এই মিটিঙে উপস্থিত ছিলেন। ইউপিডিএফ-এর পক্ষ থেকে তাদের এক শীর্ষস্থানীয় নেতা পার্বত্য চট্টগ্রামের চলমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন এবং ইউপিডিএফ জেএসএস-এর সাথে আলোচনা পুনরায় শুরু করতে রাজী রয়েছে বলে তাদেরকে জানান। তিনি তাদের মাধ্যমে জেএসএস এর প্রতি নতুন করে আলোচনার প্রস্তাব দেন।

তিন জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ বলেন তারা জেএসএস নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করবেন এবং তারা ইউপিডিএফ ও জেএসএস এর মধ্যে মধ্যস্থতার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন।

৬. ২০০০ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায় দুই পার্টির মধ্যে আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যস্থতাকারীদের অনেক চেষ্টার পর ও জনগণের চাপের ফলে জেএসএস নেতৃবৃন্দ ইউপিডিএফ এর সাথে এই বৈঠকে বসতে বাধ্য হন। তবে আলোচনায় তাদেরকে আন্তরিক দেখা যায়নি। জেএসএস প্রতিনিধিরা জানান আলোচনার পর দুই পার্টির মধ্যে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তারা লিখিতভাবে কোন চুক্তি করতে পারবেন না। অন্যদিকে ইউপিডিএফ এর প্রতিনিধিরা চুক্তি লিখিত হতে হবে বলে পরিস্কারভাবে জানিয়ে দেন। বৈঠকে উপস্থিত মধ্যস্থতাকারীগণও ইউপিডিএফ এর সাথে এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন এবং বলেন সরকারের সাথে জেএসএস-এর যে মৌখিক চুক্তি হয়েছে তার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের আপামর জনগণকে খেসারত দিতে হচ্ছে। তাছাড়া চুক্তি লিখিত না হয়ে মৌখিক হলে পরে তা নানাভাবে ব্যাখ্যা হতে পারে এবং এর ফলে দুই পার্টির মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি ও নতুনভাবে দূরত্ব তৈরি হতে পারে। বৈঠকে ইউপিডিএফ দুই পার্টির মধ্যে ঐক্য ও সমঝোতার লক্ষ্যে লিখিতভাবে তিন দফা প্রস্তাব দেয়। এগুলো হলো:

১. অচিরেই ইউপিডিএফ এবং জনগণের ওপর আক্রমণ বন্ধ করা

২. সরকারের বিরুদ্ধে ন্যুনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা

৩. ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের লক্ষ্যে ইউপিডিএফ ও জেএসএস-সহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহের সমন্বয়ে 'জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট' গড়ে তোলা।

জেএসএস নেতৃবৃন্দ এখনো পর্যন্ত ইউপিডিএফ এর উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে তাদের মতামত জানায়নি। দুই পার্টির মধ্যে কি ধরনের ঐক্য হবে সে ব্যাপারেও উক্ত বৈঠকে আলোচনা হয়। ইউপিডিএফ এর পক্ষ থেকে তিনটি বিকল্প প্রস্তাব দেয়া হয়। এক. দুই পার্টি কর্তৃক যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের জন্য যৌথ তৎপরতা। দুই. একে অপরের কর্মসূচীতে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে যুগপৎ কর্মসূচী গ্রহণ। তিন. চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে জেএসএস নিজে কর্মসূচী গ্রহণ করবে এবং ইউপিডিএফ সে কর্মসূচীতে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করবে এই শর্তে যে, জেএসএস ইউপিডিএফ এর ওপর তাদের আক্রমণ বন্ধ করবে।

এই তিন বিকল্প প্রস্তাবের যে কোন একটি জেএসএস তাদের সুবিধা অনুসারে গ্রহণ করতে পারবে বলে ইউপিডিএফ এর পক্ষ থেকে জানিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো এতেও জেএসএস কোন ইতিবাচক সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়। এখানে বলে রাখা দরকার, ইউপিডিএফ চুক্তিতে জনগণের মৌলিক দাবিগুলোর কোনটি পূরণ করা হয়নি বলে সমালোচনা করে। কিন্তু তা সত্বেও জনগণের মধ্যে ঐক্য ও আন্দোলনের বৃহত্তর স্বার্থে ইউপিডিএফ চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য জেএসএস কে সহযোগিতা দিতে সম্মত হয়। কারণ ইউপিডিএফ দুই পক্ষের মধ্যে হানাহানি ও সংঘাত হোক তা অতীতেও যেমন চায়নি, এখনও চায় না। ঐক্য ও সমঝোতার স্বার্থে এটা ইউপিডিএফ এর পক্ষ থেকে একটি বড় ধরনের ছাড়।

কিন্তু যে পার্টি সরকারের সাথে চুক্তি করে আন্দোলনকে বন্ধক দিয়েছে ও সরকারের নিকৃষ্ট দালালে পরিণত হয়েছে তাদের কাছে ঐক্য ও সমঝোতা বড় কথা নয়। জনগণের স্বার্থ তাদের কাছে অর্থহীন। এমনকি চুক্তি বাস্তবায়নও আর তাদের আসল উদ্দেশ্য নয়। সেজন্য এত বড় রকমের ছাড় দেয়ার পরও তারা ইউপিডিএফ এর সাথে ঐক্য করতে এগিয়ে আসেনি। অথচ চুক্তি বাস্তবায়নে ইউপিডিএফ সহযোগিতা করবে এ কথা শুনলে জেএসএস নেতৃবৃন্দের খুশী হওয়ারই কথা। কারণ তারা হরহামেশা চুক্তি বাস্তবায়নে জনগণের সহযোগিতা কামনা করে থাকেন। তাই জেএসএস নেতৃবৃন্দের আন্তরিকতার অভাবের কারণে মিটিং কোন চুক্তি ছাড়াই শেষ হয়।

এই বৈঠকের পরপরই জেএসএস তাদের পুরোনো কর্মসূচীতে ফিরে যায়। অর্থাৎ নতুন করে ইউপিডিএফ ও জনগণের ওপর সন্ত্রাসী আক্রমণ শুরু করে। এমনকি বৈঠকের একদিন আগে (২২ সেপ্টেম্বর) জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্যরা বরকল থানার হাজাছড়ি গ্রামের সাম্য মৈত্রী বৌদ্ধ বিহার থেকে শ্রমণ অবস্থায় ইউপিডিএফ এর দুই সদস্যকে অপহরণ ও খুন করে।

৭. সেপ্টেম্বরের ঐ মিটিঙের পর জেএসএস নেতৃবৃন্দের অসম্মতির কারণে দুই পার্টির মধ্যে নতুন করে আর বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। ইউপিডিএফ জেএসএস-কে আলোচনার টেবিলে

২য় পাতায় দেখুন

শেষ পাতা

পিসিপি'র উদ্যোগে শহীদ মংশে মারমার ৩য় মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে মাটিরাঙ্গা সদরে শহীদ মংশে মারমার ৩য় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সকাল সাড়ে এগারটায় মিছিলটি মাটিরাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠের পাশ থেকে শুরু হয়ে বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এরপর তবলছড়ি সড়ক চত্বরে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিঠুন চাকমা, কেন্দ্রীয় সদস্য সন্তোষ চাকমা, ইউপিডিএফ সদস্য জয়মোহন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মলিনা চাকমা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা শহীদ মংশে মারমার হত্যাকারী জেএসএস সদস্যদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানান এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকৃত ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী এখনো তথাকথিত অপারেশন দাবানল নাম দিয়ে সেনা সন্ত্রাস জারি রেখেছে। এতে সাধারণ নিরীহ জনগণ হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

বক্তারা শহীদ মংশে মারমার শোককে শক্তিতে পরিণত করে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

পিসিপির বিভিন্ন শাখায় কর্মিসভা অনুষ্ঠিত

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে বিভিন্ন শাখায় কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬ ডিসেম্বর ২০০২ শুক্রবার বিকাল ২টায় মাটিরাঙ্গা থানা শাখার উদ্যোগে মাটিরাঙ্গা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং ৮ ডিসেম্বর ভেইবোনছড়া শাখার উদ্যোগে কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়।

মাটিরাঙ্গা থানা শাখার কর্মিসভায় সভাপতিত্ব করেন ভবতোষ চাকমা। সভা পরিচালনা করেন সকিরণ চাকমা। আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মিঠুন চাকমা, অর্থ সম্পাদক দীপংকর ত্রিপুরা ও কেন্দ্রীয় সদস্য সন্তোষ চাকমা। হিল উইমেন্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আলোচনা করেন অর্থ সম্পাদক মলিনা চাকমা।

থানা শাখার মর্যাদা প্রাপ্ত ভেইবোনছড়া শাখার কর্মিসভায় সভাপতিত্ব করেন রিক্যান চাকমা ও সভা পরিচালনা করেন অনি বিকাশ চাকমা। সভায় আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মিঠুন চাকমা ও সহ সাধারণ সম্পাদক স্বপন চাকমা। হিল উইমেন্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আলোচনা করেন খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি স্বর্ণা চাকমা।

উক্ত দুই কর্মিসভায় আলোচকগণ পিসিপির শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচীর যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করেন ও বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আন্দোলনে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন। এছাড়া আলোচকগণ পিসিপির গঠন, পটভূমি ইত্যাদি ব্যাখ্যা করেন। কর্মিসভায় অংশগ্রহণকারী পিসিপির কর্মিবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেন এবং নেতৃবৃন্দ সে সব প্রশ্নের উত্তর দেন।

পিসিপি চট্টগ্রাম থানা শাখার উদ্যোগে বৈসাবি উপলক্ষে আলোচনা সভা ও রক্তদান কর্মসূচী

লিটন তালুকদার॥ পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সেতুবন্ধন মহান বৈ-সা-বি উপলক্ষে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বন্দর থানা শাখার উদ্যোগে ব্যারিষ্টার সুলতান আহম্মদ চৌধুরী ডিগ্রী কলেজের হলরুমে এক আলোচনা সভা ও রক্তদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভা ও রক্তদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ও সভাপতিত্ব করেন ছাত্রনেতা সুগ্রীম চাকমা। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বকুল কান্তি চাকমা, দীপংকর চাকমা ও সন্ধানীর পক্ষ থেকে জুলি চৌধুরী। আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন বৈসাবি জুম্ম জনগণের জাতীয় উৎসব হলেও জুম্ম জনগণ এখনো অবাধে ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উৎসব পালন করতে পারছে না। প্রতি বৈসাবিতেই প্রতিক্রিয়াশীলরা কোন না কোন অঘটন ঘটিয়ে থাকে।

তারা বলেন, বর্বর দমন পীড়ন ও সরকারের এথনিক ক্লিনজিং নীতির কারণে জুম্মদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে জুম্মদের অধিকার রক্ষিত না হলে তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যও সুরক্ষিত হবে না। নেতৃবৃন্দ পূর্ণস্বায়ত্তশাসন আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

২০মে চট্টগ্রামে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ১৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বন্দর নগরী চট্টগ্রামে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ১৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ১৩তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০ মে সকাল ১১টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর উদ্বোধন করেন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের কর্মি ও বাংলাদেশ লেখক শিবিরের ঢাকা নগর শাখার সভাপতি প্রাণেশ সমাদ্দার। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের প্রতি তার দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেন। দেশের প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দও সংহতি বক্তব্য রাখেন। এরপর এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী বের করা হয়। সারা পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ দেশের বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শত শত পাহাড়ি ছাত্রছাত্রী এতে অংশগ্রহণ করেন।

বিকেলে মুসলিম হলে এক আলোচনা সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পিসিপি সভাপতি জেলাস চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার বিষয়বস্তু ছিল "ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি চেতনার আন্দোলনে বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক দলের করণীয়"। আলোচনা করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক সুনীতি ভূষণ কানুনগো, চবি'র বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মুনিরুজ্জামান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এ কে কাসেম ফজলুল হক ও ইউপিডিএফ-এর পক্ষ থেকে রবিশংকর চাকমা।

এরপর ২১ থেকে ২৩ মে পিসিপি'র কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে মিঠুন চাকমাকে সভাপতি, অলকেশ চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও দীপংকর ত্রিপুরাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৮৯ সালের ২০ মে ঢাকায় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের জন্ম। সে বছর ৪ঠা মে লংগদু গণহত্যার প্রতিবাদ জানাতে ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত পাহাড়ি ছাত্ররা এই সংগঠনের জন্ম দেন। এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক পাহাড়ি সংগঠনগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়।

গঠনের পর থেকে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারের পরিচালিত দমন পীড়নের বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করতে থাকে। তাদের কার্যক্রমের ফলে হতাশায় নিমজ্জিত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ নতুনভাবে স্বপ্ন আশা ও দিশা পান। দেশের জনগণকে এতদিন যাবৎ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে কি ঘটছে সে ব্যাপারে অন্ধকারে রেখেছিল। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কল্যাণে তারা প্রকৃত সত্য জানতে পারেন এবং দেশের সচেতন বুদ্ধিজীবী ও প্রগতিশীলরা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন।

প্রথম দিকে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রামে কার্যক্রম চালাতে পারেনি। পরে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতৃত্বের মধ্যে প্রগতিশীল আপোষহীন ধারাটি প্রাধান্যে আসলে এই অবস্থা দূর হয় এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ অচিরেই সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে কার্যক্রম ও আন্দোলন ছড়িয়ে দেয়। তবে এ জন্য বহু সরকারী ও সেনাবাহিনীর বাধা-ষড়যন্ত্র পাহাড়ি ছাত্র পরিষদকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। সরকার ও সেনাবাহিনী পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের অগ্রগতি রোধ করার জন্য চেষ্টার কম করেনি। পার্বত্য গণ পরিষদ, বাঙালি কৃষক শ্রমিক কল্যাণ পরিষদ, মুখোশ বাহিনী ইত্যাদি চরম প্রতিক্রিয়াশীল ও সন্ত্রাসী সংগঠন দিয়ে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের আন্দোলনকে ঠেকিয়ে রাখতে সেনাবাহিনী আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। কিন্তু কোন কিছুই পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের উত্থান ও অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করতে পারেনি।

১৯৯৭ সালে সরকারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের প্রাক্কালে জনসংহতি সমিতি আত্মসমর্পনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দেয়। পুরো সংগঠনকে বাগিয়ে নিতে ব্যর্থ হলে সংগঠনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কতিপয় সুবিধাবাদী ও ধান্ধাবাজদের জনসংহতি নেতৃত্ব হাত করে নেয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করা হলে তাদেরকে দিয়ে জেএসএস লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে "দুই নাম্বারী" ছাত্র পরিষদ গঠন করে। তাদের সৃষ্ট এই সুবিধাবাদী ছাত্র বাহিনীটি আত্মসমর্পনের পক্ষে অগ্রিম প্রচারণা চালায়। জনগণের বহু ত্যাগ তিতিক্ষা ও রক্তের বিনিময়ে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে সরকারের কাছে বন্ধক দেয়ার কাজে যাতে কেউ বাধা দিতে না পারে সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই জেএসএস নেতৃত্ব পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও বিভাজন সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

কিন্তু সুনির্দিষ্ট আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ জনসংহতি সমিতির ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে সাধারণ ছাত্র সমাজ তথা জনগণের কাছে দিবালোকের মতো পরিষ্কার কারা পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকৃত আন্দোলনের পক্ষে এবং কারা সরকারের ক্রীড়নক ও দাবার গুটির মতো ব্যবহৃত হচ্ছে। জনগণ ও ছাত্র সমাজ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জন্ম নেয়া জনসংহতি সমিতির মদদপুষ্ট সুবিধাবাদী ছাত্র গ্রুপটিকে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছে। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের অগ্রযাত্রাকে কোন সময় রোধ করা যায়নি। ভবিষ্যতেও যাবে না। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ বরাবরই সুসংবদ্ধ আন্দোলন ও প্রগতিশীলতার প্রতীক হিসেবে আপামর ছাত্র সমাজের মধ্যে বিরাজ করবে।

পাহাড়ি যুব ফোরামের মহা প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত

৪ এপ্রিল বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি যুব ফোরাম এর প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে সকাল ১১টায় খাগড়াছড়ি স্বনির্ভর এলাকা থেকে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি খাগড়াছড়ির গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এরপর যুব ফোরাম শাপলা চত্বর মুক্তমঞ্চে এক সমাবেশের আয়োজন করে। বন্দর নগরী চট্টগ্রাম সহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকা থেকে শত শত পাহাড়ি যুবনারী র‍্যালি ও সমাবেশে অংশগ্রহণ করে।

পাহাড়ি যুব ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য দীপংকর চাকমার পরিচালনায় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক রিক্তন চাকমা। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য প্রভু রঞ্জন চাকমা, চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির সদস্য সচিব মাইকেল চাকমা ও মিটুশ চাকমা প্রমুখ।

৫ এপ্রিল পাহাড়ি যুব ফোরামের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। রিক্তন চাকমা এত সভাপতিত্ব করেন। কাউন্সিল অধিবেশনে সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রভু রঞ্জন চাকমা সাংগঠনিক বক্তব্য পেশ করার পর বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকদের মতামত গ্রহণ করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির ওপর সবিশেষ আলোচনা ও আগামী দিনে ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে অপু চাকমাকে সভাপতি, প্রভু রঞ্জন চাকমাকে সহসভাপতি, দীপংকর চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক, রিন্টু চাকমাকে সহসাধারণ সম্পাদক, মাইকেল চাকমাকে অর্থ সম্পাদক, মিটুশ চাকমাকে দপ্তর সম্পাদক, মংশে মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক ও চৈতন্য বিকাশ চাকমাকে তথ্য ও প্রচার সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়।

শহীদ অমর বিকাশ চাকমার ৭ম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) খাগড়াছড়ি জেলা শাখা ৭ মার্চ শহীদ অমর বিকাশ চাকমার ৭ম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেছে। এ উপলক্ষ্যে হবংপুজ্যায় অবস্থিত স্মৃতিস্তম্ভে সকালে পুষ্পস্তবক অর্পন করা হয়। ইউপিডিএফ এর পক্ষ থেকে কালোপ্রিয় চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সমারী চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে পুলক জ্যোতি চাকমা পুষ্প স্তবক অর্পন করেন। এ সময় আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

এরপর তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

উল্লেখ্য, খাগড়াছড়িতে সেনাসৃষ্ট মুখোশ বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে অমর বিকাশ চাকমা ১৯৯৬ সালের ৭ মার্চ হবংপুজ্যায় শহীদ হন।

হল উইমেন্স ফেডারেশন গুরগুজ্যাছড়ি এলাকা কমিটি গঠিত

১৫ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ির গুরগুজ্যাছড়িতে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের এলাকা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এইচ.ডব্লিউ.এফ কেন্দ্রীয় নেত্রী অন্তরিকা চাকমা, মলিনা চাকমা ও জেলা শাখার কণিকা দেওয়ান এ সময় উপস্থিত ছিলেন। ম্যাকি দেওয়ানকে আহ্বায়ক, শুক্লা চাকমাকে যুগ্ম আহ্বায়ক, রিপা চাকমাকে সদস্য সচিব ও তন্দ্রা তালুকদার ও টিটুনী চাকমাকে সদস্য করে এই কমিটি গঠন করা হয়।

হিল উইমেন্স ফেডারেশন ভেইবোনছড়া বিশেষ থানা কমিটি গঠিত

১৬ ফেব্রুয়ারি হিল উইমেন্স ফেডারেশনের থানা কমিটির মর্যাদা প্রাপ্ত ভেইবোনছড়া কমিটি গঠিত হয়েছে। সোনালী চাকমাকে সভানেত্রী, রুনু চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও কনিকা চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। কমিটিটি ১১ সদস্য বিশিষ্ট।

হিল উইমেন্স ফেডারেশন খাগড়াছড়ি জেলা শাখার কাউন্সিল সম্পন্ন

১৭ ফেব্রুয়ারি হিল উইমেন্স ফেডারেশন জেলা শাখার কাউন্সিল পেরাছড়াস্থ হিল স্টার ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। এক দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশনে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি স্বর্ণা চাকমা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইলিরা দেওয়ান, কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক অন্তরিকা চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক স্বর্ণজ্যোতি চাকমা, জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক পুলক জ্যোতি চাকমা। সভা পরিচালনা করেন কনিকা দেওয়ান।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, বর্তমান সময়ে হিল উইমেন্স ফেডারেশন হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি নারীদের বলিষ্ঠ মুখপাত্র। সেনাবাহিনী কর্তৃক পাহাড়ি নারীদের ওপর যে অবর্ণনীয় অত্যাচার চালানো হচ্ছে তার বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সংগঠিত করার পাশাপাশি হিল উইমেন্স ফেডারেশন আপামর জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে ভূমিকা পালন করছে। পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে আলাদাভাবে নারী অধিকার কায়েম হতে পারে না। দেশে নারী নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে বক্তারা বলেন, সারা দেশে যে হারে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে চলেছে তার কু-প্রভাব পার্বত্য চট্টগ্রামেও এসে পড়ছে। এ ব্যাপারে তারা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, পাহাড়িদের মধ্যে নারী নির্যাতনের কতিপয় রূপ দেখা যায় না যা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে রয়েছে। অথচ বহিরাগত ও সামরিক-আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যদের হাতে পাহাড়ি নারীরা প্রতিনিয়ত শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে পাহাড়ি নারীদের সতর্ক থাকতে হবে এবং এ সমস্ত দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। আলোচনা সভা শেষে স্বর্ণা চাকমাকে সভাপতি হিসেবে পুনঃনির্বাচিত করা হয় এবং কণিকা দেওয়ানকে সাধারণ সম্পাদক ও সেক্টলী চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট হিল উইমেন্স ফেডারেশন খাগড়াছড়ি জেলা শাখার পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়।

টোকিওতে বৈসাবি পালিত

১ম পাতার পর

জুম্মনৃত্য পরিবেশন করলেন। উল্লেখ্য, তারা একমাস পূর্ব থেকে শুধুমাত্র ভিডিওতে জুম্মনৃত্য দেখে তা থেকে শিখে অভ্যাস করে নেন। আমাদের জুম্ম কর্মীরা বেশ কয়েকটি জুম্ম গানও বেশ সুন্দরভাবে পরিবেশন করলেন। খাদ্য তালিকার মধ্যে জুম্মদের হাঙ্গর মাছের সালাদ পরিবেশন উপস্থিত জাপানীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করে।

এবারের বৈসাবি অনুষ্ঠানে দু' শ জনের অধিক জাপানী আমন্ত্রিত হয়ে অংশগ্রহণ করেন, যা গতবারের চেয়ে দ্বিগুণ। এ থেকে ধারণা করা যায় জুম্মদের প্রতি জাপানীদের আগ্রহ উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে।

অনুষ্ঠানের শেষদিকে একটি সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয় যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম সমস্যা, জাপানের আইনু সমস্যা ও মালয়েশিয়ার সারাওয়াক সমস্যার একটি তুলনামূলক আলোচনা করা হয়। এতে পেনালিস্ট হিসেবে অংশগ্রহণ করেন জুম্মদের পক্ষ থেকে চিচিক্কো চাকমা, সারাওয়াক থেকে টম এডওয়ার্ডসন ও আইনু থেকে মি. হাসেগাওয়া। সিমপোজিয়ামটি পরিচালনা করেন জাপানস্থ বাংলাদেশ বিষয়ক খ্যাতনামা এনজিও "শাপলা নীর" এর প্রাক্তন সম্পাদক মি. সিমোজাওয়া তাকেশি।

চিচিক্কো চাকমা বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরে জুম্মদের উপর সরকারের জাতিগত নিপীড়ন ও বৈষম্যমূলক নীতির বর্ণনা দেন। কিভাবে জাপানসহ অন্যান্য দেশের ওডিএ গ্রহণ করে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগতদের পুনর্বাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর বিভিন্ন সুবিধাদি সৃষ্টি করে যাচ্ছে তারও বর্ণনা দেন এবং জাপানের মধ্যে ওডিএ বন্ধ করার আপিল জানালে প্রচুর সমর্থন আদায় করেন। তিনি বলেন, জাপানীদেরই কষ্টার্জিত আয়করের অর্থ দিয়ে যদি জুম্মদের দুর্ভাগ্য সৃষ্টি হয় তাহলে তাতে তাদেরও দায়িত্ব আছে জুম্মদের রক্ষা করার। তিনি এ ব্যাপারে গণসচেতনতা গড়ে তোলার জন্য জাপানীদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান। উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং চিচিক্কো চাকমা তার যথাযথ উত্তর দেন।